পাহাড়ীদের মন জয়
পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশী সাহায্য ও সামরিকায়ন

মূল লেখাঃ জেনেক্কে অ্যারেন্স
অনুবাদকঃ সিদেথা

প্রথম পর্ব

বাংলাদেশে উন্নয়ন সাহায্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান সামরিকায়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনে শুধু খোরাক যুগিয়েছিল তা নয়, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং জুম্মদের সংস্কৃতি ও জীবনাচারকে ধারাবাহিকভাবে ধ্বংস করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতে যে কোন রাজনৈতিক সমাধানে দাতাদের (সংস্থা) নব্য উপনিবেশবাদী ও উদ্ধত দৃষ্টিকোণে মৌলিকভাবে পরিবর্তন, দরিদ্রদের কাঠামোগত সহায়তার জন্য একটা স্পষ্ট বাছাইয়ের উপর সাহায্যের প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে ইচ্ছা এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের স্বীকৃতি প্রয়োজন।

দাতা দেশগুলো গ্রহীতা দেশগুলোর মানবাধিকার ও গণতন্ত্রায়নের পর্যবেক্ষণের উপর উন্নয়ন সাহায্যকে শর্তসাপেক্ষ করার বিষয়টি ক্রমে বাড়ছে। যাই হোক, অনেক দাতা দেশ ও সংস্থা যুগ্ম মানদন্ড চর্চা করছে। দক্ষিণের অনেকগুলো দেশে সাহায্যের ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। খুব কম সংখ্যক ক্ষেত্রে এটি (মানবাধিকার লঙ্ঘন) কমেছে এবং এমনকি উন্নয়ন সাহায্য বন্ধ হয়েছে। যেমন- ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে। ১৯৯১ সালে ইন্দোনেশিয়ার আর্মিদের দ্বারা পূর্ব তৈমুরে রক্তক্ষয়ীর ঘটনা ঘটার পরে ডাচ সরকার ইন্দোনেশিয়ার দেওয়া সকল ধরণের উন্নয়ন সাহায্য বন্ধ করেছে। যাই হোক, দ্বিচারিতাও দেখা গেছে যখন তার পরে (সাহায্য বন্ধ করার পরে) বাণিজ্য সংযোগ শক্তিশালী হয়েছিল। ডাচ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য এমনকি আগের চেয়ে বেড়েছিল।

মানবাধিকারের নির্ণায়কের (মানদন্ড) প্রয়োগ দাতা দেশ ও সংস্থাদের আত্ম-স্বার্থের উপর অধিকাংশ নির্ভরশীল হয়েছে। বাংলাদেশে গুরুতরভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হওয়ার পরও এ দেশে দাতারা বিশাল সাহায্যের প্রবাহ বন্ধ করতে বা কমিয়ে দিতে নাকচ করেছে (অর্থাৎ সাহায্য দেওয়া চালিয়ে গেছে)। এ লেখায় সামরিকায়ন ও প্রায় গণহত্যার ক্ষুদ্র অংশ যেমন মানবাধিকার লঙ্ঘনকে চিহ্নিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থাকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। দাতা সরকার ও প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থাকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করেনি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার ও আদিবাসী জুম্মগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ বছরেও বেশি সংঘাত বন্ধে দাতাসংস্থাগুলো সাহায্য বন্ধ বা কমিয়ে দিতে নাকচ করেছে। এছাড়াও চলমান সাহায্যকে শর্তসাপেক্ষ করতে ও দ্রুত সমাধানে সহায়তা করতেও উদাসীনতা দেখিয়েছে। দাতাদের থেকে শোনা যুক্তি, বাংলাদেশের মতো গরীব দেশে সাহায্য বন্ধ করা অনৈতিক এবং যদি সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে গরীব লোকেরা ভুগবে। কিন্তু এটা দ্বিচারিতা। সকল সাহায্যের ক্ষুদ্র অংশ গরীবকে উপকার করছে। অধিকাংশ সাহায্য বড় পরিমাণে পুঁজি ভোগের স্থাপনার প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে। ফলে গরীবের আসলে লাভ হচ্ছে না। এবং অনেক পুঁজি দাতাদের দেশে চলে যায় পণ্য আমদানি (সেসব দেশ থেকে), পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞদের বেতন দেওয়ার মাধ্যমে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতির সম্পদের উপর দাতাদের আগ্রহও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক অব্যবহৃত (অনুত্তলিত) প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র, কয়লা ও ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে এবং সেখানে (পার্বত্য চট্টগ্রামে) অনেক তেল (খনি) পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিদেশী কোম্পানী ইতিমধ্যে এসব সম্পদ ব্যবহারের (উত্তোলন) জন্য আগ্রহ দেখিয়েছে।

দাতা সরকার ও প্রতিষ্ঠানের অনাগ্রহের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাঙালিদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে তথ্য ও আগ্রহের ঘাটতি বাংলাদেশ সরকারের দমনের (পাহাড়ীদের) পলিসি পার পেতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক কার্যক্রম চালাতে সাহায্য করে। এটি (দাতাসংস্থা ও বাঙালিদের অনাগ্রহ) বাংলাদেশ সরকারকে জনসংহতি সমিতি ও জুম্মদের, যে শব্দটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করে, আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনৈতিক দলের সাথে মেকি আলোচনা করতে এবং ১৯৯৪ সালে ভারতের ত্রিপুরায় প্রায় ৫০০০ উদ্বাস্তুদের দুইবারের প্রত্যাবর্তন করতে সুযোগ দিয়েছে। যাই হোক, সাড়ে তিন বছরের আলোচনায় কোন ফলপ্রসু হয় নাই এবং বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক সমাধানে কোন ইচ্ছা ছিল না। তখনও দাতা সংস্থারা সাহায্য চলমান রেখেছে আগের মতোই এবং এ সময়ে আলোচনার (জনসংহতি ও সরকারের মধ্যে) ফলাফলকে অপেক্ষা করে নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

এ লেখায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করে এটি বলা যায় যে, বাংলাদেশে উন্নয়ন সাহায্য প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান সামরিকায়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনে শুধু ঘোরাক যুগিয়েছিল তা নয়, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং জুম্মদের সংস্কৃতি ও জীবনাচারকে ধারাবাহিকভাবে ধ্বংস করেছে। অপরদিকে এটি বলা হয়ে থাকে যে, দাতা সরকার ও দাতা সংস্থাদের বাস্তব পদক্ষেপ পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতে রাজনৈতিক সমাধানে অবদান রাখতে পারত। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতে যে কোন রাজনৈতিক সমাধানে দাতাদের (সংস্থা) নব্য উপনিবেশবাদী ও উদ্ধত দৃষ্টিকোণে মৌলিকগত পরিবর্তন প্রয়োজন। সাহায্যের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরুপে পরিবর্তনের ইচ্ছা যেটি বিশ্বের সম্পদের সুষম বন্টনের দিকে এগোবে এবং এটির ভিত্তি হবে একটা স্পষ্ট বাছাইয়ের উপর, যেখানে দরিদ্র ও শোষিত শ্রেণী তাদের নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে কাঠামোগত সাহায্যের প্রয়োজন এবং আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের জন্য স্বীকৃতি প্রয়োজন, যাতে করে তারা নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে। বিতর্ক,সঠিক নাকি ভুল সাহায্যের শর্তসাপেক্ষগুলো যেগুলো অবশ্যই আগ্রহের জায়গা, এ লেখায় উল্লেখ করা হয় নাই।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদেশী হস্তক্ষেপের ইতিহাস

মুঘল সাম্রাজ্যের সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সাথে ট্রিবিউটারি (অধীনস্থ; তবে কর দিতে হত না। শুধুমাত্র বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা দিতে হত) সম্পর্ক ছিল কিন্তু এ এলাকা (পার্বত্য চট্টগ্রাম) মূলত বিচ্ছিন্ন ছিল। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসকদের দ্বারা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থগুলোকে সুরক্ষিত করতে সীমান্ত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে উল্লেখ করার মতো বিদেশী হস্তক্ষেপ শুরু হয়। একজন সুপারিটেন্ডেন্ট, যেটা পরে ডিস্ট্রিক কমিশনারে রুপান্তরিত হয়েছিল, এর অধীনে রাজাকে স্বীকৃতি দিয়ে রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে ব্রিটিশ (রাজ) পরোক্ষভাবে শাসন (পার্বত্য চট্টগ্রামে) প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্রিটিশ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ভূমিকে সরকারি সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীতে ওই ভূমির উপর প্রজাস্বত্ব দেওয়া হয়েছিল। জুম্ম প্রথা অনুসারে, সকল ভূমি সামষ্টিক সম্পত্তি এবং গ্রামের হেডম্যান দ্বারা লোকজনের (জুমচাষী) মধ্যে জুম চাষের জন্য বন্টন করে দেওয়া হত।

ব্রিটিশ সমতল ভূমিতে চাষাবাদও প্রবর্তন করেছিল। অফিসিয়ালি বলা হল যে, জুম চাষ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু আসল কথা ছিল- ভূমির কর বাড়ানো এবং একই সময়ে জুমচাষীরা যদি এক জায়গায় থিতু হয়ে বসবাস করে তাহলে তাদের থেকে রাজস্ব আদায় করা সহজ হবে। এবং তখনই ব্রিটিশ সরকার রাজাদের উপর কম নির্ভরশীল হবে। এমনকি এ প্রক্রিয়াটি (জুম চাষীদের জুমভূমি থেকে সমতলে নিয়ে আসাটা) খুবই ধীরগতির এবং বাঙালি অভিবাসীরা সমতল ভূমিতে চাষাবাদের এ সূচনার সুবিধা করেছিল (সুবিধা নিয়েছিল)। এবং তাদেরকে (বাঙালিদের) সেই ধরণের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। একই সময়ে সমতল ভূমিতে চাষাবাদ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে আদিবাসীদের মধ্যে এবং একই গ্রুপের মধ্যে বিভেদ করেছিল। যারা নদীর তীরে, বিশেষ করে চাকমা ও মারমা, সমতল ভূমিতে চাষাবাদ করতে সক্ষম হয়েছিল, তারা তুলনামূলকভাবে বেশি উপকৃত হয়েছিল, (তাদের চাইতে) যে গ্রুপ (জনগোষ্ঠী) যেমন ম্রো, বম, পাংখোয়া পাহাড়ে মূলত জুম চাষের উপর নির্ভরশীল হয়ে বসবাস করেছিল। সমতল ভূমিতে চাষাবাদ নদীর তীরে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করেছে (আগে নদীর তীরে সমতল ভূমিতে পাহাড়ীরা বসবাস করত না।) এবং বাণিজ্য ও নগর স্থাপনা বাড়াতে, টাকার প্রচলন ও পণ্যের উৎপাদনেও সমতল ভূমিতে চাষাবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। [দেওয়ান ১৯৯১: সিএইচ ৪] তাই আত্ম-নির্ভর অর্থনীতি (জুম চাষ নির্ভর অর্থনীতি) থেকে বাজার নির্ভর অর্থনীতিতে রুপান্তরিত হয়েছিল। জুম চাষে আরও বাঁধা দিতে ব্রিটিশ দুই তৃতীয়াংশ এলাকে রিজার্ভ ফরেস্ট (সংরক্ষিত বন) হিসেবে ঘোষণা করেছিল। তাদের জুমভূমির একটা বিশাল এলাকা থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। এইসব বনভূমিতে (জুমচাষীদের) প্রবেশাধিকার সীমিত হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে ভূমির উপর চাপ বেড়েছিল (জুম ভূমি কমে আসছিল) এবং জুম চাষের চক্রের পতিত সময় (একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চাষ না করে ফেলে রাখার সময়) কমে ১৫-২০ বছর থেকে ৮-১০ বছর হয়েছিল। [দেওয়ান ১৯৯১]

১৯০০ সালে তথাকথিত '১৯০০ রেগুলেশন' পাশ করা হয়। এটি (১৯০০ রেগুলেশন) পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদা দেয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতল থেকে বাঙালিদের ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া হস্তক্ষেপকে (সমতল থেকে আসা) একটি কঠোরভাবে সীমিতকরণ করা হয়েছিল (অর্থাৎ এ রেগুলেশন পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল)। এটির সাথে একটি বিশেষ বিচার ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবর্তন করা হয়েছিল যেখানে আদিবাসীদের থেকে সমতল অঞ্চলের কাছে ভূমি হস্তান্তরের বিষয়টি নিষিদ্ধ ছিল এবং সকল প্রকার (জমি) হস্তান্তরের জন্য স্থানীয় ডিস্ট্রিক কমিশনারের, স্থানীয় হেডম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে, অনুমোদন দরকার ছিল। '১৯০০ রেগুলেশন' ছিল নিঃসন্দেহে কৌশলগত কারণে, যেমন- যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা ব্রিটিশ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তাদেরকে শান্ত করতে, যাতে করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি বাফার হিসেবে কাজ করবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর অন্যদের 'বন্য প্রাণীর দৌড়' (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর আঘাত) মোকাবেলায়। আজকাল, যাই হোক, জুম্ম জনগণ সাধারণত এখনও এ ১৯০০ রেগুলেশনকে মূল্য দেয়, যেহেতু এটি তাদের এলাকাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল এবং বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের অবজ্ঞার চেয়ে তাদের স্বার্থকে অনেক বেশি সুরক্ষিত করেছিল। জনসংহতি সমিতির অনেকগুলো দাবির মধ্যে অন্যতম একটি দাবি ছিল '১৯০০ রেগুলেশনকে' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়ে চট্টগ্রাম শহর ও বন্দরসহ কলকাতাকে হারানোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছিল। (অর্থাৎ কলকাতা শহরটাকে যেহেতু ভারতের অংশের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তাই কলকাতার বদলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানকে দেওয়া হয়।) পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদ্ভূমিকে, যদিওবা ভারতের সাথে যুক্ত হবার কথা ছিল, ভারসাম্য করা হয়েছে (একটা দিয়ে আরেকটা নেওয়া) পাঞ্জাবের শিখ অধ্যুষিত অঞ্চল ফিরোজপুর এবং জিরা উপজেলার সাথে। [মেই ১৯৮৪:৯৮] পাকিস্তানের শাসনের সময় পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদাকে সীমিত (ক্ষুন্ন) করতে '১৯০০ রেগুলেশন'কে অনেকবার সংশোধন করা হয়েছে এবং সবশেষে ১৯৬৪ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের এ বিশেষ মর্যাদা বিলুপ্ত করা হয়। এর ফল হয়েছিল সমতল থেকে বাঙালিদের স্রোত পার্বত্য অঞ্চলে বাড়তে থাকে এবং এরই ধারাবাহিকতায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের উপর (বাঙালিদের) শোষনও বাড়তে থাকে।

১৯৫০ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক শোষণ একটা নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে যখন পাকিস্তান সরকার পার্বত্য অঞ্চলকে উন্মুক্ত করে (বাণিজ্যের জন্য কাজ করে) এবং বিদেশী পুঁজির সাহায্যে শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৫৩ সালে চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী পেপার মিল স্থাপনার নির্মাণ শেষ হয়। বিদেশী ফান্ডের সাহায্যে সেই (মিল) নির্মাণকার্য হয়েছিল যেখানে বিশ্ব ব্যাংক থেকে ৪.২ মিলিয়ন ডলার লোন নেওয়া হয়েছিল। মোট ব্যয় হয়েছিল ৬৫. ৯০ মিলিয়ন রুপি (প্রায় ১৩ মিলিয়ন ডলার), যেখানে বাজেটের তিন-চতুর্থাংশ অর্থ ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে শিল্পোৎপাদনের যন্ত্র ও যন্ত্রসামগ্রী কিনে ব্যয় হয়েছিল। মিলিয়ন টন বাঁশ ও নরম কাঠ কাগজ উৎপাদনের জন্য কাটা হয়েছিল। সেই মিল ১০,০০০ টি পদের সৃষ্টি করেছিল এবং ৯৫% চাকরিজীবিরা ছিল বাঙালি এবং নিচু পদমর্যাদার চাকরিতে কয়েকজন জুম্ম ছিল। একই রকম ঘটেছিল কর্ণফুলী রেয়ন মিলের ক্ষেত্রেও যেটি ১.৩ মিলিয়ন রুপির বিদেশীর ফান্ড নিয়ে ১৯৬৬ সালে নির্মাণ হয়েছিল। তদ্রুপভাবে কানাডা সরকারের ফান্ডের টাকায় ১৯৭০ সালে বেতবুনিয়া সেটেলাইট স্টেশন তৈরী হয়েছিল, যেটি সেবা দিয়েছিল শুধুই এলিট শ্রেণীদের যাদের টিভি সেট এবং দীর্ঘদূরত্বের টেলিফোন কলের সামর্থ্য আছে। [দেওয়ান ১৯৯১: ২২৪, ২২৫, ২৩৯]

১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে ইউএসএআইডি'র ফান্ড নিয়ে কাপ্তাই বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল এবং সর্বমোট খরচ হয়েছিল ২.৪ মিলিয়ন রুপি। কাপ্তাই বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদার বিষয়টি বিলুপ্ত করা হয়। বাঁধের ফলে যে জলাধার তৈরী হয়েছিল, তাতে ১,০৩৬ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত ছিল। যার মধ্যে ২১, ৮৫৩ হেক্টর সমতল ভূমি ছিল যেটা পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামের ৪০ শতাংশ আবাদী ছিল। [দেওয়ান ১৯১১] এক লক্ষ লোক উদ্বাস্তু হয়েছিল এবং অধিকাংশ কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি। তাদের মধ্যে অনেকেই ভারতে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না অথবা জুম চাষের দ্বারা বাঁচতে হয়েছিল। কাপ্তাই প্রকল্প (যেখান থেকে দেশের মোট ব্যবহারের একটি ক্ষুদ্র অংশ উৎপাদিত হত) থেকে উৎপাদিত ১% বিদ্যুৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবহৃত হয়েছিল। এছাড়াও, এমনকি অধিকাংশ আদিবাসীদের ঘরে বিদ্যুৎ নেই।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কানাডিয়ান কনসাল্টেন্সি ফরেস্টালকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য সম্ভাবনাগুলো গবেষণা করতে আমন্ত্রণ করেছিল। এবং এ সংস্থা ১৯৬৬ সালে গবেষণা শেষ করে বলেছিল যে, কাপ্তাই বাঁধের আগে আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা আরোপিত সীমাবদ্ধতার সাথে ভারসাম্য ছিল। কিন্তু এর (কাপ্তাই বাঁধ) পরে চাষাবাদের উপরে একটা দুর্যোগ চক্র মাটির উর্বরতার নিঃশেষ, বনাঞ্চল ও মারাত্মক খরা এবং অবশিষ্ট ভূমির উপর আরও বর্ধিত চাপ তৈরী করেছে। (এন্টি স্লেভারি সোসাইটি ১৯৮৪:৩৩) এটি আরও উপসংহারে বলেছে, স্থায়ী এককভাবে কৃষির ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন যখনই সম্ভব তখনই অবশ্যই করা দরকার। অধিকাংশ পাহাড়ী জনগোষ্ঠীরা বেতনধারী হবে বনাঞ্চলে বা অন্য কোন উন্নয়নশীল ইন্ডাস্ট্রিতে এবং নিবিড়ের ভিত্তিতে সীমিত ভালো জমির শ্রেণীতে কৃষকদের, যারা স্থায়ী কৃষি চর্চা করছে, তারা তাদের থেকে খাদ্য কিনে। [পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ১৯৯১: ৭৬] পাহাড়ে এটা ভবিষ্যতের উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য সুর (ঠিক) করে দেয়। ফরেস্ট্রাল জুম চাষকে সীমিত করতে এবং হর্টিকালচার প্রবর্তন করতে সুপারিশ করেছিল। ১৯৭০ সালে হর্টিকালচার সূচনা হয়েছিল। বাঁধ (কাপ্তাই বাঁধ) নির্মানি ও তার পরবর্তীতে বাজার নির্ভর উন্নয়ন কর্মসূচীর দ্বারা আদিবাসীদের আত্ম-নির্ভরশীল অর্থনীতি ধ্বংস সূচনা হয়েছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে রাজনৈতিক উন্নয়ন

১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতার যুদ্ধের পর বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং এরপর জুম্মদের একটি প্রতিনিধি দল ১৯৭২ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানে সাথে দেখা করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ও ১৯০০ সালে রেগুলেশন পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছিলেন। শক্তিশালী বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাবনা নতুন রাষ্ট্রের সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো ও ইতিহাসকে অবজ্ঞা করেছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যিনি জাতিকে স্বাধীনতাকে দিয়েছিলেন, তিনি এ প্রতিনিধি দলকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে দাবিনামাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলেছিলেন এটি (দাবিনামাগুলো) নৃগোষ্ঠীর অনুভূতিকে উস্কানি দেবে। জুম্মরা নবগঠিত সরকারের কাছ থেকে সুরক্ষার কোন আশা না পেয়ে ফিরে এসেছিলেন এবং জনসংহতি সমিতি নামে তাদের নিজেদের একটা রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। তার ঠিক এক বছর পরে শান্তি বাহিনী নামে এ দলের একটা সশস্ত্র শাখা গঠন করা হয়েছিল। ১৯৭৬ সালের আগে কোন আক্রমণ হয়নি। ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর পেট্রোলের (টহল) সময় প্রথম আক্রমণ করা হয়েছিল (শান্তি বাহিনী কর্তৃক)। ১৯৭৫ সালে মুজিবের রাঙ্গামাটি সফরের সময়ে জুম্ম জনগণের ক্ষোভে আগুন লাগিয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন (পাহাড়ীদের) বাঙালি হয়ে যেতে এবং হুমকি দিয়ে বলেছিলেন যে, তারা (জেএসএস) যদি প্রতিরোধের আন্দোলন করে, তার ফলাফলস্বরুপ এ অঞ্চলে সমতল থেকে বাঙালি পুনর্বসিন ও সেনাবাহিনীর পাঠানোর হুমকি দিয়েছেন। |মেই ১৯৮৪:৫৮-৫৯| এর পরে জুম্মরা রাগে-ক্ষোভে ওই আলোচনা সভা ত্যাগ করেছিল। ১৯

৭৫ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান একটা সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং পুরো দেশে সামরিক শাসন জারি করেছিলেন। জেনারেল জিয়া পশ্চিমা সরকার ও তাদের সহায়তার দ্বারা বিশেষ করে আমেরিকার বর্ধনমান তুলনামূলকভাবে মদতপুষ্ট ছিলেন। মুজিব সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সাথে মিত্র হয়ে আছে এবং যদিও তিনি পশ্চিমাদের থেকে অনেক সাহায্য ও (দেশ) পুনর্গঠনের জন্য সাহায্য পেয়েছিলেন, তিনি পশ্চিমা সরকার ও প্রতিষ্ঠান থেকে শর্তমূলক সাহায্য যেমন সাহায্য কনসোর্টিয়াম, নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কারণ সেইসব সরকার ও প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের উপর প্রভাব বাড়াতে ইচ্ছুক ছিল। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিশেষ করে বড় ধরণের বন্যা ও ১৯৭৪ সালে তার পরবর্তী দুর্ভিক্ষের সময়ে মুজিব তাদের চাপে পড়ে বিশ্ব ব্যাংকের নেতৃত্বে সাহায্য কনসোর্টিয়াম নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। (রিয়াজ ১৯৯৪: সিএইচ ৪)

	আদমশুমারী ১৯৯১			আদমশুমারী ১৯৮১			আদমশুমারী ১৯৭৪	
	মোট	ট্রাইবাল (শতাংশ)	নন-ট্রাইবাল (শতাংশ)	মোট	ট্রাইবাল (শতাংশ)	নন-ট্রাইবাল (শতাংশ)	ট্রাইবাল (শতাংশ)	নন-ট্রাইবাল (শতাংশ)
বান্দরবান	২২৯,৬১৩	৪৭	৫৩	১৬১,৯৮৭	৫৫	৪৫	নাই	নাই
খাগড়াছড়ি	৩৪০,০৯৫	৪৮	৫২	২৬৫,৫৯০	৬৫	৩৫	নাই	নাই
রাঙ্গামাটি	৩৯৭,৭১৩	৫৭	৪৩	২৮৯,৮৯৭	৬৩	৩৭	নাই	নাই
মোট	৯৬৭,৪২০	৫১.৫	৪৮.৫	৭০৮,৪৫৬	৬২	৩৮	৮১	১৯

উৎস: পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, আপডেট ২, এপ্রিল ১৯৯৪, ফুটনোট ১১, পৃষ্ঠা ৯

যাই হোক, মুজিবের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য পরিকল্পনা করা হয়নি। যখন জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন পশ্চিমা সাহায্য বেড়েছিল এবং দেশ খুব করে বিশ্ব পুঁজিবাদের অর্থনীতিতে সংযুক্ত হয়। এবং একই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যও উন্নয়ন কর্মসূচী শুরু হয়েছিল। মুজিবের আমলে রাষ্ট্রীয়করণ শিল্প কারখানাগুলোর (জিয়াউর রহমানের আমলে) বিরাষ্ট্রীয়করণ হয়েছিল। মুজিবের বিপরীতে জেনারেল জিয়া বাঙালি জাতীয়তাবাদ হতে পৃথক করতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উপর জোর দিয়েছিলেন, যেটি পশ্চিম বঙ্গ হতে বাঙালিকে পৃথক করতে ব্যাখ্যা করেছিল। সরকারের ক্ষমতার স্তর জাতীয়তাবাদী থেকে পরিবর্তন হয়ে নতুন ধনী ও সেনাবাহিনীর হাতে যায় এবং তারা একে অপরকে খুবই সাহায্য করেছিল। এই প্রচলন জেনারেল এরশাদের শাসনামল পর্যন্ত চলছিল।

যখন ভারত মুজিবের সাথে সংযুক্ত হয় এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তাদের দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সম্পর্ক জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৫ সালে অনেকটা সিআইএ সহায়তায় সেনাবাহিনীর অফিসারদের কর্তৃক মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করার পরে ভারত কর্তৃক একটা সম্ভাব্য আগ্রাসনের বিষয়ে গুজব ছড়িয়েছিল। সেই সময় হতে তার পরবর্তীর বিভিন্ন সরকার ভারতকে একটি হুমকি হিসেবে দেখত এবং উভয় দেশই পাওয়ার গেইম খেলেছিল। ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করেছিল গঙ্গা (নদী) পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে কলকাতার উপকারের জন্য এবং একই সাথে বাংলাদেশে আসা পানি প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধকে ব্যবহার করেছিল। উভয় পক্ষ একে অপরকে তাদের রাষ্ট্রীয় সীমানায় 'সন্ত্রাসী' স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাপোর্ট করেছে বলে নিয়মিত অভিযোগ করে। বাংলাদেশ ভারতকে দোষারোপ করেছিল জেএসএসের চলমান প্রতিরোধের জন্য আর অপরদিকে ভারতের স্বাধীনতাকামী আন্দোলন যেমন আসামি উলফাকে বাংলাদেশ সাপোর্ট করেছে এবং পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই'কে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের প্রশিক্ষণ দিতে অনুমতি দিয়েছে বলে ভারত থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে। এটি অভাবনীয় যে, ভারত এ ইস্যুকে ব্যবহার করেও তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য বাংলাদেশকে চাপে ফেলে যেমন, বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব ভারত একটা ট্রানজিট রুট। অনুরূপভাবে, বাংলাদেশ ভারতকে বলেছে, ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার কারণ নয়। তার চেয়ে বরং ঝামেলায় তাদের নিজেদের ভূমিকার মুখোমুখি হচ্ছে।

ভূমিহীন বাঙালিদের পুনর্বাসন

জিয়ার আমলে সমতল থেকে হাজার হাজার ভূমিহীন বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের পুনর্বাসনের জন্য খুব গোপনে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এবং ১৯৭৮ সাল থেকে পুনর্বাসন প্রকল্প শুরু হয়েছিল। তার পাশাপাশি বিশাল পরিমাণে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ১৯৮০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের একটি গোপনীয় চিঠিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার থেকে অন্যান্য জেলায় সরকারি কর্মকর্তাদের পাঠানো হয়েছিল। অন্যান্য জেলা থেকে নন-ট্রাইবাল (বাঙালি) ভূমিহীনদের দ্বিতীয় ধাপে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের জন্য সেখানে গাইডলাইন দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর পাহাড়ী জমি, ৪ একর মিশ্র জমি বা ২.৫ একর ধান্য জমি দেওয়া হবে এবং নগদ অর্থ ও ৬ মাসের জন্য খাদ্যশস্য দেওয়া হবে (এরকম লেখা ছিল) [এন্টি স্লেভারি সোসাইটি, ১৯৮৪: পরিশিষ্ট ১]। ১৯৮২ সালে তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল যেখানে আরও ২,৫০,০০০ জন বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করা হয়। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ৪,০০,০০০ এর অধিক ভূমিহীন বাঙালিকে পুনর্বাসন করা হয়েছিল। তাদেরকে অধিকাংশ উর্বর নদীর ভ্যালীতে পুনর্বাসন করা হয়েছিল। যদিও সরকারের আনুষ্ঠানিকভাবে পুনর্বাসন কর্মসূচী ১৯৮৫ সালে শেষ হয়েছিল কিন্তু বাঙালিদেরকে এখনও পর্যন্ত পুনর্বাসন করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বুমিল্লা জেলায় সরকারের প্রকল্পের কারণে উদ্বাস্তু হওয়া বাঙালিদের ১৯৯৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করা হয়েছিল। ১৯৯৩-৯৪ সালে রাঙ্গামাটি থানার মগবান মৌজায় ৫০০ একরের জায়গায় পুনর্বাসন করা হয়েছিল, যে জায়গাগুলোতে সিএইচটিডিবি (পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড) কর্তৃক ফার্ম প্রজেক্টের জন্য ১৯৭৭-৭৮ জুম্মদের পুনরায় সেটেল করা হয়েছিল। জুম্ম জনগণ এতে কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি। সম্প্রতি পুনর্বাসনের নামে তথাকথিত 'ভাসমান লোকদের' (যাযাবর বাঙালি) পুনর্বাসন করা হয়েছে কিন্তু ওই ভাসমান বাঙালি প্রকৃতপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন আসা বাঙালি।

সরকারের পুনর্বাসন কর্মসূচীর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যায় একটি নাটকীয় পরিবর্তন এসেছিল। এ দেশের শুরুতে (রাষ্ট্র গঠনের সময়ে) আদিবাসী জনসংখ্যা ছিল ৯৮ শতাংশের চেয়েও বেশি, ১৯৭৪ সালে এটি কমে ৮১ শতাংশ হয়েছিল এবং বর্তমানে ৫,০০,০০০ এর চেয়েও কম আদিবাসী জনসংখ্যা, বাস্তবে বাঙালিরা এ জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। [টেবিল ১] সমতলের উর্বর ভূমির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ভূমির অকার্যকর তুলনা করে সরকারিভাবে পাহাড়ে কম জনসংখ্যার ঘনত্ব ও সমতল জায়গাগুলোর বেশি জনসংখ্যাকে বাঙালিদের পুনর্বাসনের যুক্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, মূল উদ্দেশ্য ছিল জুম্ম জনগণের চেয়ে বাঙালিদের জনসংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া এবং তাদের (জুম্ম) প্রতিরোধ আন্দোলন ও স্বায়ত্বশাসনের দাবিকে ধ্বংস করা। এছাড়াও, বাঙালিরা জুম্মদের জমি অবৈধভাবে দখল করেছিল এবং এটার (ভূমি দখল) জন্য তারা ভূয়া জমি দলিলও নেয়। বাঙালিদের পুনর্বাসন অধিকন্তুরে ভূমির উপর চাপ বৃদ্ধি হয়েছিল। এমনকি জুম্মদের তাদের ভূমি থেকে বিশাল পরিমাণে উচ্ছেদ করার ফলে তাদেরকে শেষ অবলম্বন হিসেবে আগের জুম চাষের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। জুম ভূমির চাষের জন্য পতিত জমির মেয়াদ এখন কমে ৩ থেকে ৪ বছর হয়েছে অথবা মাঝেমধ্যে এমনকি এর চেয়েও কম হয়েছে।

সরকারি অফিসারেরা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কাছে স্বীকার করেছিল যে, বিগত সরকারের অধীনে ৪,০০,০০০ এর বেশি বাঙালি পুনর্বাসন একটি ভুল হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেটেলারদের সরিয়ে দিতে জেএসএসের যে দাবি ছিল, সেটাকে সরকার প্রত্যাখ্যান করেছিল এ যুক্তি দিয়ে যে, বাংলাদেশ সংবিধানের অনুসারে যেকোন নাগরিক দেশের যেকোন জায়গায় সেটেল হতে পারে। অপরদিকে জুম্মরা বলেছিল যে, ১৯০০ রেগুলেশন, যেটি এখনও বাতিল হয় নাই, সেটার অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের জন্য বন্দোবস্ত সীমিত এবং ভূমির (মালিকানা) হ্যানান্তরের জন্য ডিস্ট্রিক কমিশনারের অনুমতি লাগে, যাঁকে আবার স্থানীয় হেডম্যানের সাথে পরামর্শ করতে হয়। এ নিয়মগুলো প্রবলভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ সরকার দাবি করেছিল যে, ১৯৭৮ ও ১৯৮৫ সালের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৪,০০,০০০ বাঙালিকে পুনর্বাসন করা হয়েছিল, তাদেরকে (বাঙালি) খাস জমি [সরকারি পতিত জমি] দেওয়া হয়েছিল। এগুলো ছাড়াও অনেক সেটেলারদের শুধু খাস জমি না, অধিক উর্বর জমিতে পুনর্বাসন করা হয়েছে যেখানে খাস জমি ধারণাতে একটা সমস্যা (বিতর্ক) আছে। সরকার যে জমিগুলোকে খাস জমি বলে সেটা জুম্মদের প্রথাগত জুম ভূমি ও বনাঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং যেটাকে তারা বলে সাধারণ জমি, যেটার মালিকানা স্থানীয় জনগোষ্ঠী। জুম ভূমি হেডম্যান কর্তৃক পরিবারগুলোর

চাষাবাদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং বনজ সম্পদ আহরণের জন্য বনাঞ্চল সকলের জন্য উন্মুক্ত। খাস জমির ধারণাটি জুম্মদের ভূমির ধারণাটির সাথে মিলে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিকায়ন

বাঙালি পুনর্বাসনের সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি বৃদ্ধি হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতকে সামরিক সমাধান হিসেবে সামরিক ক্ষমতায় দিয়ে দেখার উপলব্ধি হয়েছে। ১৯৮৪ সালে এন্টি স্লেভারি সোসাইটি বলেছিল যে, ১৯৮০ সালের দিকে কিছু ৩০,০০০ সৈন্য অর্থাৎ বাংলাদেশের সকল নিয়মিত সৈন্যের আনুমানিক এক তৃতীয়াংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে। এবং ১৯৭৬ সালে পুলিশ স্টেশন বৃদ্ধি পেয়ে ১২টি থেকে ২৮টি হয়েছিল [এন্টি স্লেভারি সোসাইটি ১৯৮৪: ৫৭]। আন্তর্জাতিক সিএইচটি কমিশন সামরিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিল এবং সেই তথ্যে দেখা যায় ১৯৯০ সালে ৮০টির চেয়েও পুলিশ ক্যাম্প, ২৩০টির চেয়েও আর্মি ক্যাম্প এবং ১০০টিরও বেশি বিডিআর ক্যাম্প ছিল। খাগড়াছড়ি জেলায় দিঘীনালায়, বান্দরবান জেলায় রুমা ও আলিকদমে ক্যান্টনমেন্ট তৈরী করা হয়েছিল এবং রাঙ্গামাটি জেলায় খাগড়াতে এক চতুর্থাংশ তৈরী করা হয়েছে। কাপ্তাইয়ে একটি নাবাল বেস এবং খাগড়াছড়ি মহালছড়িতে কাউন্টার-ইন্সারজেন্সি ট্রেনিং সেন্টার আছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্মি ও প্যারামিলিটারি অর্থাৎ আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঠিক সংখ্যা জানাটা খুব কঠিন। সৈন্যের পরিমাণ ৩৫,০০০ থেকে ৬০,০০০ এর বেশি হতে পারে। সর্বনিম্ন হিসাব অর্থাৎ ৩৫,০০০ জন সৈন্যকে বিবেচনায় নিলে এটি দাঁড়ায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ৫,০০,০০০ এর চেয়েও কম সংখ্যার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতি ১৫ জন জুম্ম লোকের বিপরীতে একজনের চেয়েও আইনশৃংখলা বাহিনী আছে।

টেবিল ২: প্রধান গণহত্যার তালিকা

কানুনগো পাড়া, এপ্রিল ১৯৭৯: ২৫ জন জুম্মকে হত্যা করা হয়েছে, ৮০টি ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
কাউখালী, মার্চ ১৯৮০: ৩০০ জনের চেয়েও বেশি জুম্মকে হত্যা করা হয়েছে, ৬০০টি ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
মাটিরাঙ্গা-তবলছড়ি, জুন ১৯৮১: প্রায় ৫০০ জন জুম্মকে হত্যা করা হয়েছে, ১০০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
ভূষণছড়া, মে ১৯৮৪: ১০০ জনের চাইতেও বেশি জুম্মকে হত্যা করা হয়েছে, ৪০০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
পানছড়ি-দিঘীনালা-খাগড়াছড়ি-মাটিরাঙ্গা, মে ১৯৮৬: ৫০০ জন জুম্মকে হত্যা করা হয়েছে,২,০০০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
বাঘাইছড়ি, আগস্ট ১৯৮৮: ৩৮ জন জুম্মকে হত্যা করা হয়েছে, ২৫০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
লংগদু, ১৯৮৯: ৩৬ জুম্মকে হত্যা করা হয়েছে, হাজারখানেক বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
মালিয়া, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২: ৩০ জন জুম্মকে হত্যা করা হয়েছে।
লোগাং, এপ্রিল ১৯৯২: হাজারখানেক জুম্মকে হত্যা করা হয়েছে, ৫৫০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
নানিয়াচর, নভেম্বর ১৯৯৩ [যুদ্ধ বিরতির সময়়ে] : ২৯ জুম্মকে হত্যা করা হয়েছে, ২৫টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
বান্দরবান, মার্চ ১৯৯৫: ৩০০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৯০ সালে ডিসেম্বরে সিএইচটি কমিশনের কাছে সামরিক কর্মকর্তারা ব্যাখ্যা করেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্মিদের প্রধান উদ্দেশ্য হল শান্তি বাহিনী বা শান্তি বাহিনীর সন্দেহভাজন লোকের বিরুদ্ধে মিলিটারি অপারেশনের দ্বারা গেরিলা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কাউন্টার-ইন্সারজেন্সির (বিদ্রোহ দমন) ব্যবস্থায় পাহাড়ীদের সামরিক নিয়ন্ত্রণ রাখা। একদিকে এ কাউন্টার ইন্সারজেন্সির বেসামরিক লোকদের থেকে বিদ্রোহীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা, রসদ বন্ধ করা এবং সামরিকভাবে যুদ্ধ করা, অপরদিকে ক্ষুদ্র প্রকল্পের তথাকথিত ফ্রেন্ডশীপ প্রোগ্রামস (বন্ধুত্বপূর্ণ কর্মসূচীসমূহ) এর মাধ্যমে বেসামরিক জনগণের (পাহাড়ীদের) মন জয় করা। সেই ফ্রেন্ডশীপ প্রোগ্রামস এর মধ্যে রয়েছে অর্থ উপার্জনের প্রজেক্ট, বিদ্যালয় ও মন্দির নির্মাণ ও স্বাস্থ্য সেবা (পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ১৯৯১: সিএইচ ৩]। কাউন্টার-ইন্সারজেন্সি কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ক্লাস্টার ভিলেজে (গুচ্ছগ্রাম) জনগণকে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের অধীনে পুনর্বাসন করা। গুচ্ছগ্রামকে নিয়ে

পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। বিশাল পরিমাণে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির ফলে জুম্ম জনগণ প্রতিদিন ভয়ে থাকতে হয় এবং তাদের জীবনাচারে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনও আর্মিদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এমনকি সরকার দাবি করেছে যে, তিনটা নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান পার্বত্য জেলা পরিষদ (পাজেপ), যেটি জেনারেল এরশাদের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলোও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পাজেপ জুম্ম জনগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল কারণ এসব প্রতিষ্ঠান বাঙালিদের (সেটেলারদের) উপস্থিতিকে বৈধতা দান করেছিল এবং এসব প্রতিষ্ঠান জুম্ম জনগণের অধিকার ও পরিচয় সুরক্ষার জন্য কোন সাংবিধানিক গ্যারান্টি দেয় না। এগুলো ব্যতীত, পাজেপ অনেকটা সামরিক বাহিনীর দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল এবং তার (পাজেপ) নির্বাচন প্রক্রিয়া ও তার ফলাফল আর্মিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত। এছাড়াও, ১৯০০ রেগুলেশন এখনও বাতিল করা হয় নাই। আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সরকারের পলিসি তৈরিতে জাতীয় কমিটির মাধ্যমে আর্মিরা জড়িত আছে। এবং যে কমিটিতে জিওসি, যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, এর জন্য একটা সিট সংরক্ষিত আছে। (জাতীয়) কমিটি প্রত্যক্ষভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এবং এটিই পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পলিসি তৈরির সংস্থা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিষ্ঠা

আগে বলা হয়েছে, মুজিবের সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বড় ধরণের উন্নয়ন নকশা পরিকল্পনা করা হয়নি কিন্তু জিয়ার আমলে এ অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে। জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে ঘোষণা করেছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার মূলে রয়েছে অনুন্নয়ন এলাকা এবং তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতকে সমাধানের লক্ষ্যে বড় ধরণের উন্নয়ন কর্মসূচী শুরুর জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল । পশ্চিমা দাতারা এসব কর্মসূচীর কিছু কিছু কার্যক্রমে ফান্ড দিয়েছিল। এ এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রস্তাব তৈরি ও সম্ভাবনাগুলো গবেষণার লক্ষ্যে বিভিন্ন মিশন অভিযানের জন্য ১৯৭৬ ও ১৯৭৯ সালের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংককে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। যাই হোক, বিশ্ব ব্যাংক নিজেই এসব কর্মসূচীতে অর্থায়ন করেনি। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউএনডিপি ও ডব্লিউএইচও এসব উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রধান দাতা ছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক। একজন সরকারি অফিসার খোলাখুলিভাবে সিএইচটি কমিশনকে বলেছে যে, শান্তিবাহিনীকে ঘায়েল করতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল... ব্যবসায়ী ও ট্রাইবাল লিডারদের (উপজাতি নেতা) প্রাইভেটের উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হয়...তারা (ব্যবসায়ী ও ট্রাইবাল লিডার) সরকারের শোপিস (প্রদর্শনীয় বস্তু)। এটি (উন্নয়ন বোর্ড) মূলত ট্রাইবাল লিডারদেরকে কিনতে (পক্ষে আনতে) রাজনৈতিক ঘুষ যাতে করে তারা (ট্রাইবাল লিডাররা) শান্তিবাহিনীকে সাহায্য করতে না পারে [পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ১৯৯১:৮৪]। সরকারি লোনের সাহায্যে বান্দরবান শহরে একটি সিনেমা হল বানানো হয়েছিল এবং এ সিনেমা হলের মালিক একজন ট্রাইবাল লিডার- এটি হচ্ছে একটি উদাহরণ (রাজনৈতিক ঘুষ)। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কাউন্টার-ইন্সারজেন্সির উদ্দেশ্য চাক্ষুষপ্রমাণ হয়েছিল ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের সামরিক আইন জারির পরে যখন চট্টগ্রাম বিভাগের পার্বত্য চট্টগ্রামের দায়িত্বে জেনারেল কমান্ডিং অফিসার (জিওসি)কে (পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে) চেয়ারম্যান করা হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডেও কতগুলো প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে ছিল সড়ক নির্মাণ, টেলিকমিউনিকেশন, বিদ্যুতায়ন এবং 'মডেল' বা 'গুচ্ছ' গ্রামে জুম্মদের পুনর্বাসন ইত্যাদি। এধরণের কর্মসূচী জনগণের উন্নয়নের জন্য হয়েছে এরকম সুন্দর বয়ান স্বত্ত্বেও প্রথমত এইসব কর্মসূচী সামরিক স্বার্থকে রক্ষা করে বিশেষ করে কাউন্টার-ইন্সারজেন্সির জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রত্যেক উপজেলা থেকে প্রত্যক্ষভাবে ঢাকা পর্যন্ত টেলিকমিউনেকশন আছে কিন্তু এটি পাহাড়ীদের জন্য প্রয়োজন আছে কি? তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে যেখানে কোন টেলিফোন নাই, বিদ্যুৎ নাই আর শহর ও বাজারগুলো বাঙালিদের দখলে। এটি বলা হয়ে থাকে যে, সড়কগুলো পাহাড়ীদের তাদের পণ্যগুলোতে শহরের বাজারগুলোতে আনতে একটি সুযোগ দিয়েছে কিন্তু সড়কগুলো প্রয়োজন ছিল প্রথমত সামরিক বাহিনীর দ্রুত যাতায়াতের জন্য। বান্দরবান শহর থেকে

সামরিক বাহিনীর জন্য বিদেশী সাহায্য

১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ এইড কনসোর্টিয়াম মিটিং এর সময়ে মোট ২.১ বিলিয়ন ডলার বিদেশী সাহায্য ১৯৯৪-৯৫ লিঅর্থবছরের জন্য দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য বাজেট ছিল ২.৯ বিলিয়ন ডলার। এটির অর্থ দাঁড়ায় যে, প্রায় ৭৫% বিদেশী সাহায্য থেকে পূরণ করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালের জন্য মোট ১.৯ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিরক্ষার জন্য বার্ষিক ব্যয় সরকারি বাজেটের প্রায় ১৫% আর এটি সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে, অনানুষ্ঠানিক সামরিক (খাতে) ব্যয় আরও বেশি। অনেক সামরিক (খাতে) বাজেট দেওয়া হয় বিভিন্ন ক্যাটেগরির অধীনে যেমন টেলিকমিউনিকেশন, হাউজিং অর্থাৎ সামরিক উদ্দেশ্যকে ছদ্মবেশ ধারণ করা হয়। প্যারা-মিলিটারি বাহিনী যেমন বিডিআর এবং পুলিশের ব্যয়ের জন্য আলাদা বাজেট করা হয়। এটি সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদ নিজেকে উচ্চপদস্থ আর্মি অফিসারদের আনুগত্য হিসেবে নিশ্চিত করেছিল তাদেরকে লাগামহীন দূর্নীতি ও খুব কম সুদের হারের ঋণের সুযোগ দিয়ে। বড় পরিমাণের বিদেশী সাহায্য আর্মির অফিসারদের পকেটে চলে যায়। এরশাদেরও সেখানে একটা শেয়ার ছিল। তার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে এবং ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে আটক হওয়ার পরে নিউজপেপারের রিপোর্টে দেখা যায়, স্থানীয় মুদ্রার নোট যার মূল্য প্রায় ১ মিলিয়ন ডলার তাঁর বাসায় পাওয়া যায়। একজন বাঙালি আইনজীবি দাবি করেছিল যে, ৫০% আর্মি বিদেশীদের সাহায্যে চলে। যদিও এটা প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য যে, সামরিক উদ্দেশ্যে বিদেশী অর্থ ব্যয় করা হয়। এটি নিশ্চিতভাবে সত্য যে, বিদেশী সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশাল পরিমাণে সৈন্য মোতায়েন করে চালানো সম্ভব না। বিদেশী সাহায্য সরকারকে সামরিক উদ্দেশ্যে টাকা রিজার্ভ করতে সাহায্য করে।

উদাহরণস্বরুপ, যখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়ন এবং বাঙালিদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া চরমে, ১৯৮৫ সালে ১৯৭৩ সালে তুলনা করলে প্রতিরক্ষা বাজেটে ৪০০% এর বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ওই সময়ের পরে স্বাস্থ্যের জন্য বাজেট বেড়েছিল শুধুমাত্র ১৮%। ১৯৮৫ সালে প্রতিরক্ষা বাজেটের তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল স্বাস্থ্য (খাতের) বাজেটের চেয়ে যেখানে ১৯৭৩ সালে এটি কমে গিয়েছিল [হার্টমান এন্ড স্ট্যাডিং ১৯৮৯: ১০]। সাম্প্রতিক সময়ে চিত্র, ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক সংসদে উত্থাপিত বাজেটে দেখা যায়, প্রতিরক্ষার জন্য ১,২০৯ কোটি [১৪.৯৬%], পুলিশের জন্য ৩০৭.০৭ কোটি, বিডিআরের জন্য ১৫৭.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিরক্ষা, পুলিশ এবং বিডিআর মিলে সরকারি বাজেটের মোট ২০.৪৫% ছিল। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ছিল ১২৫৫.৫৭ কোটি [১৫.৫%] টাকা বরাদ্দ ছিল এবং স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৪০৯.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বিদেশী সাহায্যের আয় ছিল আনুমানিক ৭, ২৯৬.৬১ কোটি টাকা [হিউম্যানিটি প্রটেকশন ফোরাম ১৯৯১: ১২]।

সাহায্যের কিছু অংশ সরাসরি সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যয় হয় যেমন খাদ্য সহায়তার অংশটি। পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের, যেগুলো খাদ্য সহায়তা থেকে আসে, আওতায় ধানের প্রায় ১০% এবং গমের ৩% বিতরণ করা হয় ক্যাটেগরির প্রয়োজনীয় প্রাধান্যসমূহের অধীনে [পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ১৯৯২: ১৫]। এসেন্সেয়াল প্রায়োরিটিজ বলতে আর্মি, পুলিশ ও হাসপাতালের রোগীগুলো; খাদ্য সহায়তার দায়িত্বে ফাও কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছিল যে, খাদ্য সহায়তার অংশ যেগুলো হাসপাতালের রোগীদের কাছে চলে যায় সেগুলো খুব কম। পাশাপাশি অনেক খাদ্য সহায়তা গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে এবং একটা অংশ ফ্রি রেশন ও আরেকটা অংশ কাজের বিনিময়ে খাদ্য হিসেবে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯১ সালের মধ্যে প্রতি মাসে ১৮০০ মেট্রিক টন চাউল, যেটির মূল্য ২০০ কোটি টাকা, গুচ্ছগ্রামে ফ্রিতে বিক্রি করা হয়েছিল [হিউম্যানিটি প্রটেকশন ফোরাম ১৯৯১: ১৭]। উল্লেখিত যে, গুচ্ছগ্রামগুলো হচ্ছে বিদ্রোহ দমন কর্মসূচীর অংশ।

আমেরিকা ও ব্রিটিশ অনেক বছর ধরে সরাসরি সামরিক সাহায্যে জড়িয়ে আছে। ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান, যিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল [বিএনপি] এর প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর শাসনামলে একটি সাহায্য চুক্তি ব্রিটিশের সাথে হয়েছিল যেখানে ৭,২০,০০০ ইউরো পুলিশের টেলিকমিউনিকেশন উন্নয়নের জন্য দেওয়া হয়েছিল। এ চুক্তির আওতায় ব্রিটিশ টেলিকমিউনিকেশনের যন্ত্রপাতিও দিয়েছিল। [ভাচ সরকারকেও ফান্ডের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।] পাকিস্তানের সময়ে ইউএসএআইডি'র অফিস অব পাবলিক সেফটি'র সাহায্য যে টেলিকমিউনিকেশনের প্রকল্প শুরু হয়েছিল সেটি সম্পূর্ণ করতে এ সাহায্য দেওয়া হয়েছিল [লিফচালফ ১৯৭৯]। ১৯৭৭ সালে ব্রিটিশ আবার হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল (অনুদান দিতে চেয়েছিল)। ওই সময়ে জেনারেল জিয়া কর্তৃক সামরিক আইন জারি করা হয়েছিল। আট সদস্যের ব্রিটিশ আর্মির উপদেষ্টা কমিটি ঢাকার পাশে সাভারে 'ডিফেন্স স্টাফ কলেজ' স্থাপনে সাহায্য করতে এসেছিলেন। স্পেশাল এয়ার সার্ভিসেস (সাস) ব্রিগেডের সিনিয়র মেম্বার কর্ণেল গিবসনের নেতৃত্বে এ উপদেষ্টা কমিটি ছিল। সাস হচ্ছে ব্রিটিশের বিদ্রোহ দমনের ইউনিট এবং মালয়'তে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে রবার্ট থমসনের ইমার্জেন্সি কৌশলের উত্তরাধিকারী। (রবার্ট থমসনের বিখ্যাত বই হচ্ছে-Defeating Communist Insurgency)। এটা সাধারণত বিশ্বাস করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে ব্রিটিশ মিলিটারি মিশনের পেছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পুরো পুলিশ বাহিনী এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ আর্মির উপর পশ্চিমা গোয়েন্দার জন্য দলিলগুচ্ছ তৈরী করতে এবং পরবর্তী প্রো-পশ্চিমা আইয়ুব খান হতে পারে তা জানতে এবং কে রাজনৈতিকভাবে নির্ভরযোগ্য। কারণ ১৯৭৫ সালে নভেম্বরে আর্মিদের যে অংশ দ্বারা বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল, তাদেরকে পশ্চিমা দেশে পুরো আশ্চর্যজনকভাবে নেওয়া হয়েছিল [লিফচাল ১৯৭৯]। আজও পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশের উপদেশ ব্যবহার করা হয়; অনেক সামরিক কর্মকর্তা সিএইচটি কমিশনকে বলেছিল যে, মালায়া ছিল তাদের মডেল এবং রবার্ট থমসনের বই [১৯৯৬] ছিল বিদ্রোহ দমনের জন্য হ্যান্ডবুক।

১৯৯২ সালে ব্রিটিশ ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে মিলিটারি ট্রেনিং এর জন্য একটা চুক্তি (বিমেট) শেষ হয়। ব্রিটিশ আর্মি, বিমান বাহিনী ও নেভী থেকে তিন প্রশিক্ষক সাভারের ডিফেন্স স্টাফ কলেজের সহকারী হয়েছিলেন। ওই ট্রেনিং কোর্সে বিদ্রোহ দমনের বিষয়টি ছিল। ব্রিটিশ আমলাসূত্র অনুযায়ী, ব্রিটিশ এখনও সামরিক প্রশিক্ষণে জড়িত আছে। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকায় গিয়েছিল ট্রেনিং এর জন্য। ১৯৭০ সালের পরে আমেরিকার সাথে মিলিটারি বিনিময় কর্মসূচী হয়েছিল। তাই ব্রিটেন ও আমেরিকা উভয় দেশ বাংলাদেশের আর্মিদের বিদ্রোহ দমন পলিসিতে সাহায্য করেছিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আংশিকভাবে দায়ী।

পরোক্ষভাবে সামরিক বাহিনীতে বিদেশী সাহায্য

১৯৭০ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৮০ এর শুরুর দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক উন্নয়ন কর্মসূচী শুরু হয়েছিল। এ এলাকাগুলোকে উন্মুক্ত করা হয়েছিল এবং সম্পদগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছিল। মাটি প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ সম্পদ যেমন কয়লা, কপার ও ইউরেনিয়ামে সমৃদ্ধ। তেলের উপস্থিতির সম্ভাবনাও আছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌশলগত অবস্থান উত্তর-পূর্ব ভারতের বিদ্রোহ সূচনা ও মিয়ানমারের সামান্তবর্তী হওয়ায় অন্তত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদেশী শক্তির স্বার্থকে আংশিকভাবে স্পষ্ট করে। সৌদি আরব ও বিশ্ব ব্যাংক তেল অনুসন্ধানের জন্য যথাক্রমে ৯.২ মিলিয়ন ডলার ও ২৩ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল [এন্টি স্লেভারি সোসাইটি ১৯৮৪: ৪০]। ১৯৮১ সালে ২৫ বছরের জন্য শেল ও পেট্রো বাংলা'কে যৌথভাবে তেল অনুসন্ধানের অনুমোদন দেওয়া হয় এবং তেল অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়। চুক্তির সময় বোনাস হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ৫ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে শেল ১২০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে চেয়েছিল যেটি স্বাধীনতার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সবগুলো উন্নয়ন প্রজেক্টের মোট পরিমাণের চেয়েও বেশি [নেদারল্যান্ড ইন মে ১৯৮৪]। ১৯৮৪ সালে শেলকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাধ্য করে সরানো হয় যখন তাদের চারজন কর্মীকে শান্তিবাহিনী দ্বারা কিডনাপ করা হয়েছিল এবং তাদেরকে পরে বিশাল পরিমাণে মুক্তিপণের মাধ্যমে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন বড় ধরণের উন্নয়ন কর্মসূচী কিছু অংশ বিদেশী ফান্ড নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস্তবায়ন করেছিল। অনেকগুলো বড় কর্মসূচীর মধ্যে একটি হল খাগড়াছড়িতে নানামুখী কর্মসূচী। ১৯৭৯ সালে এ কর্মসূচী শুরু হয়েছিল এবং ১৯৭৯ সালে শেষ হয়। মূলত, এটির খরচ ধরা হয়েছিল মোট ৪১.৮ মিলিয়ন ডলার [৬২৩.৮৯ মিলিয়ন টাকা], যার মধ্যে ২৮.৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ হিসেবে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক [এডিবি] থেকে দেওয়া হয়েছিল এবং ০.৪ মিলিয়ন ডলার সহায়তা হিসেবেও দেওয়া হয়। ইউএনডিপি থেকে ০.৭ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৩ সালে এ কর্মসূচী ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছিল এবং অতিরিক্ত ৩০০ মিলিয়ন ডলার এডিবি ও ইউএনডিপি থেকে দেওয়া হয়েছিল। মোট বাজেট হয়েছিল ১,৩৮০ মিলিয়ন যার মধ্যে ৭০৮.০৫ মিলিয়ন টাকা এডিবি ও ইউএনডিপি থেকে দেওয়া হয়েছিল।

জুমচাষীদের সেটেল করতে আপল্যান্ড সেটেলমেন্ট স্কিম (ইউএসএস) ছিল নানামুখী প্রকল্পের অন্যতম একটি প্রধান উপাদান যেখানে বাজেট ছিল ৪,৭৬৯.৫০ লাখ টাকা। এ স্কিমের আওতায় খাগড়াছড়ি থেকে ২,০০০ পরিবারকে গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসন করা হয়েছিল। ইউএসএস এর আওতায় মোট ৮,০০০ একর রাবার ও ৪,০০০ একর হর্টিকালচার রোপন করা হয়। রাবার প্লান্টেশনের জন্য চার একর জমি, হর্টিকালচারের জন্য দুই একর জমি এবং বাড়িঘর নির্মাণের জন্য ০.২৫ একর জমি প্রত্যেক পরিবারকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯০-৯১ সালে যখন সিএইচটি কমিশন ওই এলাকায় পরিদর্শনে যায়, তখন লোকজন ওই জমির জন্য দলিলপত্রগুলো পায় নাই। কর্মকর্তারা নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, যখন রাবার গাছগুলো থেকে রাবার (রস) হবে, তখন এগুলো (দলিলগুলো) দেওয়া হবে। আবার যে রাবারগুলো উৎপাদন হবে সেগুলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কাছে বিক্রি করতে হবে এবং সেই রাবার কেনার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডেও একচেটিয়া (অধিকার) আছে। রাবার প্লান্টেশনে ওই সময়ে লোকদের (গুচ্ছগ্রামে থাকা পাহাড়ীদের) দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে হয়। এমনকি তারা ৪ একর রাবার প্লান্টেশনের মালিক হওয়া স্বত্ত্বেও, তাহলে কীভাবে একটা পরিবার এ জমি নিয়ে কী করবে এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য কোন জমি নাই যেখানে তারা আগে সাবসিস্টেন্স কৃষিতে নির্ভরশীল ছিল (তারা মূলত স্বনির্ভর ছিল)?

১৯৭৬ ও ১৯৮১ সালের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড 'মডেল ভিলেজ স্কিম' এ ৫,২৩,৮৬,১৩২ টাকা ব্যয় করে এবং তথাকথিক যৌথ খামার ও আদর্শ গ্রাম তৈরী করে [দেওয়ান ১৯৯১:২৪২]। ওই সময়ে ৫৫টি যৌথ খামার তৈরী করা হয়, সেখানে ৩,৩০০টি জুম্ম পরিবারকে জোরপূর্বক পুনর্বাসন করা হয়। ১৯৮২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৬০% ব্যয় মডেল ভিলেজে (প্রকল্পে) হয়। ১৯৮৫ সালে পুনর্বাসনের জন্য নতুন স্কিম গ্রহণ করা হয়েছিল

[এন্টি-স্ল্যাভারি সোসাইটি ১৯৮৪:৪১]। ১৯৮৮ সালে গুচ্ছ গ্রামের (ক্লাস্টার ভিলেজ) কর্মসূচী চালু হয়েছিল। ১৯৯০ সালে শুধুমাত্র খাগড়াছড়িতে ২০০টির বেশি গুচ্ছ গ্রাম, বাঙালিদের জন্যও, গড়ে ওঠেছিল। আগরতলা ভিত্তিক Human Protection Forum অনুযায়ী, ১৯৯২ সালে আনুমানিক ৩ লাখ জুম্ম এবং ২ লাখ বাঙালিকে গুচ্ছ গ্রামে স্থানান্তর করা হয়েছিল [Human Protection Forum 1992:9]। এটি বর্তমান জনসংখ্যার অর্ধেকের চেয়েও বেশি।

আর্মিরা লোকজনদের তাদের গ্রাম ও পৈতৃক ভূমি থেকে জোরপূর্বক সরিয়ে দিয়েছিল এবং গুচ্ছ গ্রামে পুনর্বাসন করে দিয়েছিল। **অনেক ক্ষেত্রে আর্মিরা গ্রামে এসে তাদের(জুম্মদের) ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং সেটেলার বাঙালিরা তাদের জমি নিয়েছিল।** ১৯৭৯ সালের প্রথম দিকে কিছু আর্মি অফিসারেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসভায় ঘোষণা দিয়েছিল যে, **'আমরা এ ভূমি চাই, মানুষজন চাই না'**। গুচ্ছগ্রামে লোকজন খাদ্য সহায়তার উপর নির্ভরশীল এবং দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে প্ল্যানটেশনের কাজ করানো হত। প্রায় তাদেরকে জোরপূর্বক বিনাপারিশ্রমিকে আর্মিদের কাজ করতে হয় বা খুব কম মজুরি দেয়। লোকজনের চলাচল সীমিত করা হয় এবং তাদের চাষের ভূমিতে যেতে দেওয়া হয় না। বাঙালিদেরকেও গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসন করা হয় এবং বাঙালিরা সেখানে অবর্ণনীয় দুঃখে জীবন-যাপন করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক লোকজন সন্দেহের চোখে বলে যে, **প্রকৃতপক্ষে গুচ্ছগ্রামে মানুষজন শান্তিবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আর্মিকে রক্ষা করতে মানবঢাল হিসেবে কাজ করছে।**

মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রামে অন্যতম প্রধান উপাদান হল সড়ক নির্মাণ। এ সড়ক নির্মাণের জন্য বাজেট ছিল ৬৪৪৮.৩০ লাখ, যেটি মোট বাজেটের ৪৭ শতাংশ। পাশাপাশি অন্যান্য কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন সড়কও নির্মাণ করা হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া সড়ক নির্মাণের জন্য ফান্ড দিয়েছিল। ১৯৮১ সালে ১১ মিলিয়ন ডলারের সড়ক নির্মাণ কর্মসূচী নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক চাপের কারণে বাতিল করেছিল। ১৫ বছরেরও বেশি ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রধান সড়কগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল যেগুলো প্রান্তিক অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত করে। বিশেষ করে যে জায়গায় শান্তিবাহিনীরা সক্রিয়, ওই জায়গাগুলো পর্যন্ত সড়কগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। সামরিক বাহিনীর জন্য সড়কের গুরুত্ব ইতিমধ্যে উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রামে অন্য উপাদান হল বনায়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প যেটির বাজেট ছিল ৩৪৩.৪৫ লাখ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়িতে ৩০০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। বান্দরবানে ৫০০ নোমাডিক পরিবারকে বনায়ন ও পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় পুনর্বাসন করা হয়েছিল। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সুইডিশ সরকার ৬ মিলিয়ন বনায়ন কর্মসূচীতে জড়িত ছিল কিন্তু সুইডিশ সরকার যে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করছে যারা কিনা জুম্মদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে, এমন একটি নিউজ সুইডিশ প্রেসে সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রচারের পর সুইডিশ সরকার সহায়তা বাতিল করতে বাধ্য হয়। সুইডিশের অর্থায়নে কর্মসূচী ছিল বড় ধরণের ব্যবসায়িক বন কর্মসূচীর একটি অংশ যে প্রোগ্রামের আওতায় ১ হাজার বর্গ কিলোমিটারের বীপবপন করা হয়েছিল, যেটি অশ্রেণীভুক্ত বনের ২০ শতাংশ। এর ফলে জুম্মদের জুমভূমি থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং যৌথ খামারে বসবাসের দিকে ঠেলে দেয় [Anti-Slavery Society 1984:39]।

পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি বিদেশী অর্থায়নের কর্মসূচী হল ইউনিসেফ অর্থায়নে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম যেটি ছিল ৩ মিলিয়ন ডলারের। প্রায় ৫০টি গুচ্ছ গ্রামের কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছিল। এ সেন্টারগুলোর মধ্যে রয়েছে কার্যালয়, গোডাউন ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ সেন্টার এবং স্কুল ইত্যাদি। এর আগে ইউনিসেফ সুপেয় পানীর প্রকল্প ছিল এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ছিল ম্যালেরিয়া নির্মূলিকরণ কর্মসূচী। জুম্মরা দাবি করে যে, এসব কর্মসূচী মূলত আর্মিদের উপকার করেছিল।

সরকার বড় পরিসরে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য পরিকল্পনা চলমান রাখে যেগুলো জুম্মদের ক্ষতিগ্রস্থ করে। ১৯৯২ সালে সরকার বনবিভাগ দ্বারা 'বনায়ন' নামে তিন পার্বত্য জেলায়, বিশেষ করে রাঙ্গামাটি জেলায়, ১,৭৫,০০০ একর জায়গায় গাছ লাগানোর জন্য বড় পরিসরে একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এ কর্মসূচীতে অর্থায়ন করেছিল এডিবি (ADB)। ফলে প্রায় ৪০ হাজার পরিবার, যার মধ্যে অধিকাংশ জুম্ম, উচ্ছেদের শিকার হয়েছিল। জুম্মরাও মন্তব্য করেছিল যে, যদি সরকার পরিবেশ নিয়ে সচেতন থাকত, তাহলে বিরাজমান রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে এ ধরণের বনায়ন কর্মসূচী নিত না অথবা অন্যান্য বনগুলো আছে যেগুলো থেকে অনেক (কাঠ) পাচার করা হয়েছে এবং তারা যেমনটি পরিকল্পনা করেছিল তার চেয়ে কাঠ কাটা কন্ট্রাক্টদের দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। ফলে বড় পরিসরে রাঙ্গামাটির সংসদ সদস্য ও রাজাসহ জুম্মরা প্রতিবাদ হলে সরকার ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন থেকে সরে আসে কিন্তু প্রজ্ঞাপন বাতিল হয়নি।

১৯৯৪ সালে ফেব্রুয়ারীতে রাঙ্গামাটিতে বড় পরিসরে 'ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' শুরু করা হয়েছিল। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে রাবার ও চা বাগান তৈরি। জুম্মরা আশঙ্কা করেছিল যে, এ প্রকল্পের ফলে জুম্মরা তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ হবে এবং পরিবেশ নষ্ট হবে। তারা দেখে যে, তাদের প্রথাগত জীবনযাপন ও জীবিকার উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে আরেক জায়গায় যেতে হবে।

প্রাইভেট ফান্ডিং এজেন্সি থেকে বিদেশী ঋণের জন্য কিছু বলা উচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু এনজিও আছে। অধিকাংশ এনজিও পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করতে চায় না কারণ তাদেরকে আর্মিদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে হয়। মূলত বান্দরবান জেলায় খ্রিস্টান আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু খ্রিস্টান সংগঠন যেমন কারিতাস, সিসিডিবি ও ওয়ার্ল্ড ভিশন পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করছে। তারা গুচ্ছগ্রামে ইনকাম জেনারেটিং কার্যক্রম এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচী কাজ করছে। যদিওবা এসব প্রজেক্টগুলো খুবই ছোট, তারপরও আর্মিদের অনুমোদন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ সূত্রে এটিও উল্লেখ করতে ইন্টারেস্টিং যে, সিআইএ এর সাথে ওয়ার্ল্ড ভিশনের যোগাযোগ আছে বলে জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সকল উন্নয়ন সকল কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য দুই প্রকারের। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমচাষকে বাঁধা দেওয়া। জুমচাষের ফলে বাস্তুসংস্থান (পরিবেশগত) ধ্বংস হয় বলে প্রচার করা হয়। সাধারণত সরকার ভুলে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে যে, কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কারণে অনেক জমি ধ্বংস হওয়া (পানির নীচে তলিয়ে যাওয়া), সমতল থেকে বাঙালিদের পুনর্বাসনের জন্য জমির উপর প্রায় ১০০% চাপ তৈরী হওয়া এবং বাঙালি ব্যবসায়ী (কাঠ) ও আর্মিদের দ্বারা বৃক্ষ নিধন, যেগুলো বর্তমান পরিবেশ বিপর্যয়ের বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। **পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য জুম্মদেরকে দায়ি করতে কর্তৃপক্ষ (সরকার) পছন্দ করে।** দ্বিতীয় উদ্দেশ্য যেটির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, তা হল জুম্মদের মূল স্রোতে আনা। সিএইচটি কমিশনকে একজন আর্মি অফিসার বলেছিলেন যে, আমরা তাদেরকে (জুম্মদের) প্রস্তর যুগে সংরক্ষণ করে রাখব না, আমাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনতে হবে। গভীর (মূল) উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ শোষণ করা। যেসব তথাকথিক উন্নয়ন কর্মসূচী, যেগুলো উপসংহারে বললে, হচ্ছে **আত্মনির্ভরশীল আদিবাসী অর্থনীতি থেকে বাজার নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তর** যেখানে রাবার প্ল্যান্টেশনে দৈনিক মজুরিতে রূপান্তর করা হয়েছে এবং এর ফলে জুম্মদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়েছে।

উপসংহারে এটি বলা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কর্মসূচীর বিপরীত আলঙ্কারিক অবদান আছে (উন্নয়ন কর্মসূচীর উন্নয়ন করার বদলে আরেক উদ্দেশ্য ব্যবহার করা হচ্ছে) আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ও উৎপাদনের ধরণ ধ্বংস এবং পরিবেশগত ভারসাম্যে নষ্ট করতে। যতক্ষণ পর্যন্ত না পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতের কোন রাজনৈতিক সমাধান হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম অবস্থায় সামরিক উদ্দেশ্য উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন হয়ে আসছে।

১৯৯২ সালে শান্তিবাহিনী একপাক্ষিকভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে এবং জেএসএস সরকারের সাথে রাজনৈতিকভাবে আলোচনার জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে সরকারের নীতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমালোচনা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমেদের নেতৃত্বে সরকার একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকার ও জেএসএসের মধ্যে আলোচনা হয়। জেএসএসের প্রধান দাবিগুলো হল- বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিতরে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, ১৯০০ রেগুলেশন পুনঃপ্রবর্তন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণ ও সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে ফেলা। প্রথম তিন দফা বৈঠকে উভয় পক্ষ বিরতির চুক্তিতে সম্মত হয়। রাজি হওয়া এ যুদ্ধবিরতির শর্ত হল গুচ্ছ গ্রাম ভেঙে দিতে হবে। ১৯৯৩ সালে কয়েক পরিবার গুচ্ছগ্রাম থেকে বেড়িয়ে যায় কিন্তু অনেক পরিবার তখনও গুচ্ছগ্রামে রয়ে গেছে। তাদের কোথাও যাবার মতো নেই। কারণ তাদের জায়গাজমি বাঙালি সেটেলারদের দ্বারা বেদখল হয়েছে। ওই যুদ্ধ বিরতির আরেকটি শর্ত হচ্ছে প্রশাসন থেকে আর্মিকে সরিয়ে ফেলা কিন্তু এখনও পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে জিওসি আছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্মির উপস্থিতি কমানো হয়নি। অপরদিকে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি অনুযায়ী কিছু আর্মি ক্যাম্প সরানো হয়েছে। তবে আরও বিভিন্ন জায়গায় আর্মি ক্যাম্প স্থাপনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রত্যেক বৈঠকে উভয় পক্ষ যুদ্ধ বিরতির শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ করে। বাংলাদেশ আর্মির দ্বারা যুদ্ধ বিরতির শর্তগুলো লঙ্ঘনের অভিযোগ করে এবং সরকার শান্তিবাহিনী দ্বারা লঙ্ঘনের পাল্টা অভিযোগ করে। যাইহোক, সরকারের অভিযোগগুলো প্রায় মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যেমন- ১৯৯৫ সালে ব্যাংক ডাকাতি যেটি সরকার শান্তি বাহিনীকে দায়ী করে।

এ পর্যন্ত সাতবার সরকারের পূর্ণাঙ্গ কমিটির (সব সদস্য) সাথে বৈঠক হয়েছে। ছয়বার সরকারের উপকমিটির সাথে বৈঠক হয়েছে যে কমিটির শুধুমাত্র কয়েকজন সদস্য ছিলেন। যাইহোক, ওই বৈঠকগুলো কোন ফলপ্রসু হয়নি। ওই বৈঠকগুলো হওয়া স্বত্তেও রাজনৈতিকভাবে সমাধান খুব শীঘ্রই হবার নয়। সরকার অনেকবার আলোচনার প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করেছে এবং জেএসএসের প্রধান দাবিগুলোর একটাও পূরণ করতে অনিচ্ছুক ছিল। সরকার পরিবর্তনের ফলে অনেক আশা দেখা গেছে। জনগণের মধ্যে সাধারণ অনুভূতি ছিল যে, বেগম খালেদা জিয়া বাইরের চাপের কারণে এবং দাতাগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করতে আলোচনা পুরোপুরি করতে চলেছে। সম্ভবত সরকারও আর্মির চাপে আছে এবং কমপক্ষে আর্মির একটি রাজনৈতিকভাবে সমাধানের বিপক্ষে। আর্মির নিজের পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকাটাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ আছে। যেমন- তারা ওই এলাকায় শাসক, অনেক আর্মি অফিসার ব্যবসা, উন্নয়ন কর্মসূচী, খাদ্য সহায়তা বিক্রি, বিশেষ সুবিধা ইত্যাদি থেকে বড় পরিমাণ অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করেছে। এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রশিক্ষণ ঘাঁটি। যুদ্ধ বিরতির চুক্তি সত্ত্বেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক সামরিক অপারেশ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এখনও আসতে থাকে। জেএসএসের সাথে যুদ্ধ বিরতির বিষয়ে আলোচনার শুরুর সময়ে সামরিক বাহিনী তার কৌশল কিছুটা পরিবর্তন করে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাতে সাম্প্রতিককালে সেটেলার বাঙালিদের সংগঠন গঠন করতে ব্যাকআপ দিচ্ছে। এসব বেসামরিক সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোকে ব্যাকআপ দিয়ে আর্মি বিচ্ছিন্ন করতে চায় এবং জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অপরাধ করে দেখতে চায় যেটি ১৯৯০ সালের দিকে গঠিত হয়েছে। তাদের(আর্মিদের) লক্ষ্য মূলত পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী জনগণ পরিষদ ও হিল উইমেন ফেডারেশন(এইচডাব্লিউএফ), যে সংগঠনগুলোর জনসমর্থন রয়েছে, বিশেষ করে দুই উত্তরদিকের জেলাতে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ১৯৮৯ সালে গঠিত হয়েছে, অন্যদিকে পরিষদ ও ফেডারেশন গঠিত

হয়েছে বিপুল আন্দোলনের ফলে এরশাদের ক্ষমতাচ্যুত হবার পরে, যেটির মাধ্যমে ইতি ঘটেছিল বাংলাদেশের ১৫ বছর ধরে চলমান সামরিক শাসন।

এরই প্রেক্ষাপটে এটি বলা চলে যে, সর্বশেষ গত হওয়া কয়েক বছরে আর্মির পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠা বিভিন্ন সেটেলার বাঙালিদের সংগঠনগুলোর বিপরীতে কিছু জাতীয় বাঙালি সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করেছিল এবং জুম্ম জনগণের অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসছিল। এগুলোর মধ্যে প্রধান ও স্পষ্টভাগী ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌলিক অধিকার রক্ষায় জাতীয় কমিটি। অনেক বাঙালি উপলব্ধি করেছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে যতদিন আর্মিরা ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকবে এবং সরকারে একটি দুঃখ হয়ে থাকবে, ততদিন নতুন করে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের হুমকি থাকবে এবং পুরো দেশে সামরিক শাসন চলে আসবে। যেহেতু বাঙালিদের এ সংগঠনগুলোর সমর্থন জুম্মদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটি সংবেদনশীল ছিল তাই গুটিকয়েক বাঙালি সংগঠনগুলো এ ক্ষেত্রে নাক গলিয়েছে এবং সক্রিয়ভাবে জুম্মদের সমর্থন দিয়েছে। অধিকাংশ এনজিও তাদের স্বার্থের কারণে এসব থেকে দূরে (চুপ) থেকেছে।